মুদ্রাস্ফীতি

ইউনিট ৪

পাঠ ১ : অর্থের মূল্য

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- অর্থের মূল্য কি তা বলতে পারবেন ;
- অর্থের পরিমাণ তত্ত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন ;
- ফিশারের তত্ত্ব বর্ণনা করতে পারবেন ;
- কেইনসীয় তত্ত্ব বর্ণনা করতে পারবেন।

ভূমিকা

আমরা তো সবাই দ্রব্য সামগ্রী ক্রয় করে থাকি। এক বছরের আগে আপনি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ দ্বারা যে পরিমাণ দ্রব্য কিনতে পারতেন, এক বছর পর আপনি সেই পরিমাণ দ্রব্য ঐ একই পরিমাণ দ্রব্য অর্থ দ্বারা কিনতে পারছেন না। এই ব্যাপারটি নিয়ে কি কখনও ভেবেছেন? এই যে দাম বৃদ্ধির বা হ্রাসের ফলে আপনি যে কম বা বেশী দ্রব্যে পাচ্ছেন একেই আমরা অর্থের মূল্যের সাহায্যে দেখাতে পারি। চলুন বিষয়টি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা যাক।

অর্থের মূল্য কি ?

অর্থের মূল্য হল অর্থের ক্রয় ক্ষমতা। নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ দ্বারা যে পরিমাণ দ্রব্য বা সেবা ক্রয় করা যায় তাই হল অর্থের মূল্য। অর্থের মূল্যের বহিঃপ্রকাশ ক্রয় ক্ষমতার মাধ্যমেই ঘটে। যখন দ্রব্য মূল্য বাড়ে তখন নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ দ্বারা কম পরিমাণ দ্রব্য পাওয়া যায় আবার যখন দ্রব্যমূল্য কমে সেই সময় ঐ নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ দ্বারা আমরা বেশী পরিমাণ দ্রব্য পাই। অর্থাৎ দ্রব্য মূল্য কমলে অর্থের মূল্য বাড়ে এবং দ্রব্য মূল্য বাড়লে অর্থের মূল্য কমে। তাহলে আমরা বলতে পারি – দ্রব্য মূল্য ও অর্থের মূল্যের মধ্যে বিপরীত সম্পর্ক বিদ্যমান। যেমন ধরুন, আপনি বাজারে গিয়ে দেখলেন যে, চালের মূল্য কেজি প্রতি ১০ টাকা থেকে ১২ টাকা হয়েছে আর আপনার কাছে যদি ১২০ টাকা থাকে তবে আপনি পূর্বে ১২ কেজি চাল কিনতে পারলেও এখন ১০ কেজি চাল কিনতে পারছেন। তাহলে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে, আপনার ক্রয় ক্ষমতা ২ কেজি পরিমাণ কমে যাচ্ছে। আবার যদি বাজারে দেখা যায়, চালের মূল্য ১০ টাকা থেকে কমে ৮ টাকা হয়েছে তাহলে আপনার ক্রয় ক্ষমতা বাড়বে। অর্থাৎ আপনি বর্তমান অবস্থায় ১৫ কেজি চাল কিনতে পারছেন।

তাই দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি (বা হ্রাসের) সাথে সাথে আমাদের ক্রয় ক্ষমতা কমে (বা বাড়ে)। বাজারে গিয়ে যদি দেখেন চা এর কেজি ২০০ টাকা থেকে ৪০০ টাকা হয়েছে। এক্ষেত্রে অর্থের মূল্য কমেছে না বেড়েছে এবং তা কি পরিমাণে? চিন্তা করুন।

অর্থের পরিমাণ তত্ত্ব

অর্থের মূল্য নির্ধারণের জন্য যে কয়টি তত্ত্ব বা মতবাদ প্রচলিত আছে এর মধ্যে অর্থের পরিমাণ তত্ত্বটি সবচেয়ে বেশী ব্যবহৃত।

অর্থের পরিমাণ তত্ত্বের আসল কথা হলো – অর্থের মূল্য সমাজের প্রচলিত মোট অর্থ দ্বারা নির্ধারিত হয়। অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকলে, অর্থের পরিমাণ যে অনুপাতে বাড়ে মূল্যস্তর সেই অনুপাতে বৃদ্ধি পায় কিন্তু অর্থের মূল্য সেই অনুপাতে কমে।

অন্যপক্ষে, অর্থের পরিমাণ যে অনুপাতে কমে মূল্যস্তর সেই অনুপাতে হ্রাস পায় কিন্তু অর্থের মূল্য সেই অনুপাতে বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ অর্থের পরিমাণ যদি দ্বিগুণ হয় তাহলে মূল্যস্তর দ্বিগুণ হয় এবং অর্থের মূল্য অর্ধেক হবে। পক্ষান্তরে, অর্থের পরিমাণ যদি অর্ধেক হয় তাহলে মূল্যস্তরও অর্ধেক হবে কিন্তু অর্থের মূল্য দ্বিগুণ হবে।

এখন আসুন আমরা অর্থের পরিমাণ তত্ত্বের শর্তগুলো জানার চেষ্টা করি। মূলতঃ এর অনুমিত শর্তসমূহ হচ্ছে –

১. সমাজের দ্রব্য সামগ্রীর জন্য মোট চাহিদা ও মোট যোগানের মধ্যে সর্বদাই ভারসাম্য বজায় থাকে।
২. সমাজে পূর্ণ নিয়োগ অবস্থা বিদ্যমান।

অর্থের পরিমাণ তত্ত্বের বিভিন্ন ব্যাখ্যা আছে। এর মধ্যে দুটি ব্যাখ্যা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

ক. নগদ – লেনদেন ভাষ্য বা বিনিময় সমীকরণ বা ফিশারীয় সমীকরণ
খ. নগদ ব্যালান্স তত্ত্ব বা ক্যামব্রীজ সমীকরণ বা নগদ তহবিল ভাষ্য।

ক. ফিশারিয় তত্ত্ব

যুক্তরাষ্ট্রের বিখ্যাত অধ্যাপক ফিশার ১৯১১ সালে "Purchasing Power of Money" নামক পুস্তকে অর্থের পরিমাণ তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেন। এটি ফিশারীয় তত্ত্ব নামে পরিচিত। সাধারণ মূল্য তত্ত্বের মত অর্থের মূল্যও এর চাহিদা ও যোগান দ্বারা নির্ধারিত হয়।

অর্থের চাহিদা : ফিশারের মতে, দ্রব্যসামগ্রী ও সেবা ক্রয়ের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমাণকে অর্থের চাহিদা বলা হয়। কেননা দ্রব্য ও সেবা ক্রয়ের জন্যই জনগণের কাছে অর্থের চাহিদা দেখা দেয়। সুতরাং কোন নির্দিষ্ট সময়ে জনগণের প্রয়োজনীয় দ্রব্য ও সেবা ক্রয়ের জন্য যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হয় তাই হলো সে সময়ের অর্থের মোট চাহিদা। অর্থাৎ P যদি দামস্ত র হয়, এবং T যদি ক্রয়-বিক্রয় যোগ্য দ্রব্যসামগ্রী হয় তবে, অর্থের চাহিদা = "দামস্তর $\times$ ক্রয়-বিক্রয়যোগ্য দ্রব্যসামগ্রীর পরিমাণ"

$= P \times T$

$= PT$

অর্থের যোগান

অধ্যাপক ফিশারের মতে, একটি নির্দিষ্ট মুহূর্তে দেশে প্রচলিত মোট অর্থের পরিমাণকে অর্থের যোগান বলা হয়। অর্থের প্রচলিত গতির উপর অর্থের যোগান নির্ভরশীল। কোন নির্দিষ্ট সময়ে এক একক মুদ্রা যতবার হাত বদল হয় তাই হল মুদ্রার প্রচলন গতি। ফলে "কোন নির্দিষ্ট সময়ে মোট অর্থের পরিমাণ এবং এর প্রচলন গতির গুণফলের সমষ্টি হবে অর্থের মোট যোগান।"

অর্থাৎ অর্থের মোট যোগান = মোট অর্থের পরিমাণ (M) × অর্থের প্রচলন গতি (V)
$= M \times V$
$= MV$
$\therefore$ অর্থের মোট যোগান $= MV$

এতক্ষণ তো আমরা ফিশারের তত্ত্ব অনুযায়ী অর্থের চাহিদা ও যোগানের কথা বলেছি। এবার আমরা সমীকরণের সাহায্যে বিষয়টিকে দেখার চেষ্টা করব – সমীকরণটি হলো :
অর্থের মোট চাহিদা = অর্থের মোট যোগান
$PT = MV$

ফিশার তার সমীকরণে অর্থের যোগানের ক্ষেত্রে শুধু মুদ্রার কথা বলেছেন। পরবর্তীকালে ব্যাংক সৃষ্টি অর্থ (চেক, হুন্ডি ইত্যাদি) ফিশারের সমীকরণের সংশোধিত রূপটি হল :

$\therefore PT = MV + M'V'$

$$\therefore P = \frac{MV + M'V'}{T}$$

এখানে,

P	=	দামস্তর
M	=	বিহিত মুদ্রার পরিমাণ
V	=	বিহিত মুদ্রার প্রচলন গতি
M′	=	ব্যাংকের অর্থের (চেক) পরিমাণ
V′	=	ব্যাংকের অর্থের প্রচলন গতি
T	=	ক্রয় বিক্রয়যোগ্য দ্রব্য সামগ্রীর (বস্তুগত ও সেবাগত) পরিমাণ

অর্থের পরিমাণ তত্ত্ব অনুযায়ী, স্বল্পকালে V, V′, T অপরিবর্তিত থাকে, ফলে দামস্তর (P) তথা অর্থের মূল্য সম্পূর্ণ নির্ভর করে অর্থের যোগানের (M+M′) উপর।

M+M′ দ্বিগুণ করা হলে P দ্বিগুণ হবে এবং অর্থের মূল্য অর্ধেক হবে। আবার (M+M′) অর্ধেক করা হলে P অর্ধেক হবে এবং অর্থের মূল্য দ্বিগুণ হবে। এটাই হচ্ছে ফিশারের সমীকরণের মূল কথা। আমরা এতক্ষণ ফিশারের তত্ত্বটি তাত্ত্বিকভাবে বিশ্লেষণ করেছি। এখন আমরা বিষয়টি গাণিতিকভাবে নিম্নরূপে দেখাতে পারি –

মনে করি,
$M = ৫০০$ $M' = ২৫০$
$V = ৫$ $V' = ৩$
$T = ৭০$
সমীকরণটি হলো

$$\therefore P = \frac{MV + M'V'}{T}$$
$$= \frac{৫০০ \times ৫ + ৭৫০}{৭০}$$
$$= \frac{৩২৫০}{৭০}$$
$$= ৪৬.৪২$$

অর্থাৎ $P = ৪৬.৪৬$
এখন যদি অর্থের পরিমাণ দ্বিগুণ করা হয় তবে P দ্বিগুণ হবে।

অর্থাৎ M = ১০০০ টাকা এবং M' = ৫০০ টাকা।

$$P = \frac{১০০০ \times ৫ + ৫০০ \times ৩}{৭০}$$

$$= \frac{৫০০০ + ১৫০০}{৭০}$$

$$= \frac{৬৫০০}{৭০}$$

অর্থাৎ P = ৯৩ (প্রায়)

বিপরীতক্রমে, যদি অর্থের পরিমাণ অর্ধেক অর্থাৎ M = ২৫০ এবং M' = ১২৫ টাকা) করা হয় তবে P অর্ধেক হবে।

অর্থাৎ M M' এবং P সরাসরি সম্পর্কযুক্ত।

এখন আমরা এই ঘটনাটিকে চিত্রের সাহায্যে দেখাতে পারি –

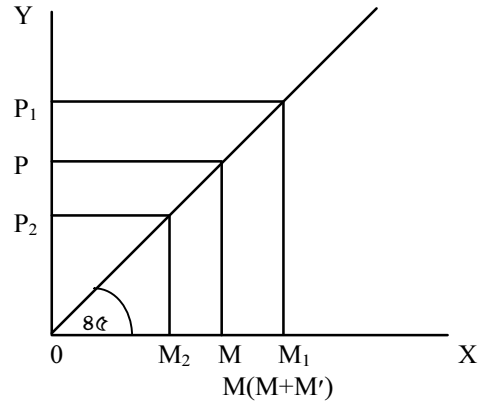

চিত্রে OX অক্ষে অর্থের পরিমাণ এবং OY অক্ষ দামস্তর নির্দেশ করে। অর্থের যোগান যদি OM হয় দামস্তর হয় OP। অর্থের যোগান যদি দ্বিগুণ অর্থাৎ OM_1 হয় তবে দামস্তরও দ্বিগুণ অর্থাৎ OM_1 যে, তবে দামস্তরও দ্বিগুণ অর্থাৎ OP_1 হয়। এবং বিপরীতভাবে অর্থের যোগান যদি অর্ধেক হয় তবে দামস্তরও অর্ধেক হয়।

সমালোচনা : ফিশারের তত্ত্বটি ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হওয়ার পরও এই তত্ত্ব সমালোচিত হয়েছে। নীচে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

১. **অবাস্তব অনুমান :** ফিশারের তত্ত্বে V, V' এবং T অপরিবর্তিত ধরা হয়েছে। কিন্তু এ অনুমান সত্য নয়। কারণ M ও M' পরিবর্তিত হলে T এবং V অবশ্যই পরিবর্তিত হবে এবং T অপরিবর্তিত হলে M, M', V, V'ও পরিবর্তিত হবে।

২. **পূর্ণ নিয়োগ অনুমান :** এই তত্ত্বটি পূর্ণ নিয়োগ অনুমানের উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু কদাচিৎই পূর্ণ নিয়োগ স্তর বিদ্যমান থাকে। জন মেনার্ড কেইনস বলেন : "কেবলমাত্র পূর্ণ নিয়োগ অবস্থায় অর্থের পরিমাণ তত্ত্বটি আপন সত্তায় প্রকাশিত হয়।"

৩. **দামস্তর এবং দ্রব্যসামগ্রীর প্রকারভেদ :** দামস্তর P এর রয়েছে নানা শ্রেণী বিন্যাস (যেমন : পাইকারী, খুচরা ইত্যাদি)। আর দ্রব্য সামগ্রীর রয়েছে নানা ধরন। এই তত্ত্বে তাই সবগুলোকে একই আওতায় ফেলে দেখানো হয়েছে।

৪. **টাকার চাহিদার অপূর্ণতা :** এই তত্ত্বে শুধু লেনদেনের জন্য অর্থের প্রয়োজনের কথা বলা হয়েছে। ফটকা কারবারী ও পূর্ব-সতর্কতার (Precaution) জন্যও অর্থের দরকার হয় তা এই তত্ত্বে নাই।

৫. **নিষ্ক্রিয় টাকার অস্তিত্ব :** এই তত্ত্বে বলা হয়েছে যে, দামস্তর অর্থের যোগানের উপর নির্ভর করে। কিন্তু এটা ঠিক না। অর্থের একটা অংশ নিষ্ক্রিয় (Idle) থাকে যা দামকে আদৌ প্রভাবিত করে না। মন্দার সময় এটা লক্ষ করা যায়।

৬. **অর্থের পরিমাণ ও মূল্যস্তরের কার্যকর সম্পর্ক :** অর্থের পরিমাণের পরিবর্তন ঘটলে কোন পদ্ধতিতে ও কি ধরনের প্রতিক্রিয়া ঘটবে তা এই তত্ত্বে আলোচনা করা হয় নি।

৭. **অর্থের পরিবর্তন ছাড়াও দামস্তর পরিবর্তন :** অর্থের পরিমাণ ছাড়াও দামস্তর পরিবর্তন হয়।

ক. শ্রমিকের দক্ষতার পরিবর্তনের ফলে দামস্তরও উৎপাদন ব্যয়ের পরিবর্তন হয়।

খ. ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন বিধি কার্যকর হলে দামস্তর বাড়বে এবং ক্রমবর্ধমান বিধির ক্ষেত্রে দামস্তর হ্রাস পাবে ইত্যাদি।

৮. **অর্থের যোগানের উপর অধিক গুরুত্ব :** চাহিদা অপেক্ষা যোগানের গুরুত্ব এই তত্ত্বে বেশি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সম গুরুত্ব দেওয়া উচিত ছিল।

৯. **অর্থের যোগানের অপূর্ণ ব্যাখ্যা :** সমীকরণে M দ্বারা কোন নির্দিষ্ট সময়ের এবং V দ্বারা অর্থের নির্দিষ্ট কালের প্রচলন গতিকে বুঝানো হয়েছে। তাই দু'টি স্বতন্ত্র ধর্মীয় উপাদানের গুণফল ($M \times V$) নিয়ম বিরুদ্ধ।

ফিশারের তত্ত্বটি ব্যাপকভাবে সমালোচিত হলেও যথেষ্ট এটি গুরুত্বের দাবিদার অর্থের যোগান বাড়লে দাম বাড়ে, এর ঐতিহাসিক সত্যতা রয়েছে। ডঃ মিল্টন ফ্রিডম্যান বলেন যে, "অর্থের পরিমাণের সরল তত্ত্বটি বাস্তবে কার্যকর রয়েছে এবং অর্থের পরিমাণ ও দামস্তরের মধ্যে সরাসরি সম্পর্ক বিদ্যমান।" স্বল্পকালে প্রয়োগের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা থাকলেও দীর্ঘকালে ফিশারের তত্ত্ব বেশী প্রযোজ্য।

অনুশীলন

ধরুন, একটি অর্থনীতিতে ১৯৯৬-৯৭ বছরে মোট উৎপাদনের পরিমাণ = ৫ মিলিয়ন একক, অর্থের মোট যোগান = ১০ মিলিয়ন টাকা, দাম স্তর = ৪ টাকা ছিল। এ বছর উৎপাদন বেড়ে ৬ মিলিয়ন একক ও দামস্তর বৃদ্ধি পেয়ে ৫ টাকা হয়েছে। অর্থের যোগান স্থির রয়েছে। এক্ষেত্রে অর্থের গতিবেগের কী ধরনের পরিবর্তন হয়েছে? চিন্তা করুন ও লিখুন।

ক্যামব্রীজ সমীকরণ

অধ্যাপক মার্শাল, পিগু, রবার্টসন প্রমুখ ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ অর্থের পরিমাণ তত্ত্বের একটি বিকল্প ভাষ্য প্রচার করেন। এই সমীকরণগুলি একত্রে ক্যামব্রীজ সমীকরণ নামে পরিচিত। এই তত্ত্বে অর্থের চাহিদা ও যোগানের সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করা হয়েছে। ক্যামব্রীজ সমীকরণটি হলো :

$M = KY = KPQ$

এখানে M = অর্থের পরিমাণ

Y = জাতীয় আয় বা ফিশারের বিনিময় সমীকরণ PQ এর সমার্থক এবং

K = জনগণের আর্থিক আয়ের অনুপাত যা নগদ ব্যালান্স হিসেবে রাখতে চায়।

নগদ পছন্দ তত্ত্ব অনুযায়ী কোন নির্দিষ্ট সময়ে দেশের মোট উৎপাদন বা প্রকৃত জাতীয় আয় (Q) অপরিবর্তিত থাকে এবং আয়ের একটা অংশ মানুষ নগদ অর্থ হিসেবে হাতে রাখতে চায় (K) যা অপরিবর্তিত থাকে, এই অবস্থায় P কেবল অর্থের পরিমাণ (M) দ্বারা নির্ধারিত হয়, কিন্তু দ্রব্যসামগ্রী ও লেনদেনের অবিচ্ছেদ্য প্রক্রিয়া।

ফিশারের সমীকরণের মতো ক্যামব্রীজ সমীকরণকেও একটি অভেদ বা Identity হিসেবে বর্ণনা করা যায়। তাই আমরা লিখতে পারি :

$$K = \frac{M}{Y} \text{ বা } \frac{M}{PQ}$$

K এমন মান গ্রহণ করবে যা M এবং KY এর সমতা বিধান করতে সক্ষম।

ধরা যাক্, $M = ৫০০$ কোটি টাকা

$Y = ১০০০$ কোটি টাকা

$K = .১$

অতএব তত্ত্ব অনুযায়ী মূল্যস্তর হবে :

$$P = \frac{৫০০}{.১ \times ১০০০}$$

$$= \frac{৫০০}{১০০}$$

$$P = ৫$$

নগদ তহবিল তত্ত্ব অনুযায়ী Q ও K যদি অপরিবর্তিত থাকে তা হলে M বা "অর্থের পরিমাণ যে হারে বাড়ে মূল্যস্তরও সেই হারে বাড়বে" এই ভাবে মূল্যস্তর হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে।

অর্থাৎ $P \uparrow \quad M \uparrow, \quad P \downarrow M \downarrow$

ক্যামব্রীজ সমীকরণের সমালোচনা :

ক্যামব্রীজ সমীকরণটি ফিশারের সমীকরণের অপেক্ষা অধিক বাস্তবসম্মত হলেও ইহা সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত নয়। ক্যামব্রীজ সমীকরণের প্রধান ত্রুটিগুলো হল :

১. **চাহিদার অপূর্ণাঙ্গতা :** এই তত্ত্বে চাহিদার দিক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হলেও নগদ পছন্দ তত্ত্ব বিবেচনা করা হয় নি।

২. **সুদের সাথে সম্পর্ক :** নগদ তহবিল সমীকরণে অর্থের চাহিদার ব্যাপারে সুদের হারের ভূমিকা সম্বন্ধে কোন সুস্পষ্ট বক্তব্য রাখে নাই। সুদের হারের সাথে নগদ তহবিলের একটি নিকট সম্পর্ক রয়েছে, অথচ এটা ক্যামব্রীজ সমীকরণে আলোচিত হয়নি।

৩. **K-এর উপর অনভিপ্রেত গুরুত্ব আরোপ :** প্রকৃত আয়ের উপর অনভিপ্রেত গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। কিন্তু K-এর উপর অন্যান্য উপাদান যেমন আর্থিক আচরণ, দামস্তর প্রভৃতির যে প্রভাব ফেলতে পারে তা আলোচনা করা হয় নি।

৪. **দামস্তর পরিবর্তনের কারণ ব্যাখ্যা করতে ব্যর্থ :** দামস্তর পরিবর্তনের কারণগুলি বিশ্লেষণে ব্যর্থ হয়েছে। আয়, সঞ্চয়, বিনিয়োগ এর মত গুরুত্বপূর্ণ উপাদানগুলি এই তত্ত্বে উপেক্ষা করা হয়েছে।

৫. **দামস্তর পরিবর্তন :** বাণিজ্যচক্রের সময় মূল্যস্তরে যে পরিবর্তন হয়ে থাকে এর ব্যাখ্যা দিতে পারে না, ১৯২৯ সালে সারা বিশ্বে যে মন্দা দেখা দেয় অর্থাৎ মূল্যস্তর হ্রাস পায়,

অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি করে সমাধান হয়নি, তাই বোঝা যায় যে মূল্যস্তর কেবল অর্থ দ্বারাই নির্ধারিত হয় না।

ক্যামব্রীজ সমীকরণ সমালোচিত হলেও এই তত্ত্বটি কার্যক্ষেত্রে অধিক প্রয়োগের দাবিদার।

অনুশীলন

ধরুন, p = ৫ টাকা, Q = ২ মিলিয়ন একক, M = ৫ মিলিয়ন টাকা, K = ?, p = ১৫ টাকা, Q ও M স্থির থাকে তাহলে K = কি পরিবর্তন ঘটে? লিখুন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১. ফিশারীয় তত্ত্বটি প্রকাশিত হয় কত সালে?

ক. ১৯৯২ খ. ১৯৩০

গ. ১৯২০ ঘ. ১৯১১

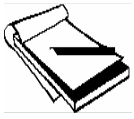

২. ফিশারীয় সমীকরণ কোনটি

ক. MV = PT খ. MV = PY

গ. MV = PO ঘ. MV = PO

৩. ক্যামব্রীজীয় সমীকরণ হলো

ক. M = KYY খ. M = KR

গ. M = RO ঘ. KPY = O

৪. অর্থের মূল্য কি?

ক. অর্থের ক্রয় ক্ষমতা খ. অর্থের বিক্রয়

গ. অর্থের পরিমাণ ঘ. রাষ্ট্রীয় প্রতিফলন

৫. ফিশারীয় তত্ত্বে গুরুত্ব দেওয় হয়েছে,

ক. অর্থের মূল্যের খ. চাহিদা যোগানের

গ. দ্রব্যের উপর ঘ. উপরের কোনটাই নয়

সত্য-মিথ্যা নির্ণয় করুন

১. ফিশারীয় তত্ত্বটি চাহিদা ও যোগানের ভারসাম্য দ্বারা আলোচিত হয়েছে।

২. ক্যামবীজ সমীকরণে K & P পরস্পর সরাসরি সম্পর্কযুক্ত।

৩. (M & M_1) এর সাথে P বিপরীত সম্পর্কযুক্ত।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. ফিশারীয় তত্ত্বটি ব্যাখ্যা করুন।

২. ক্যামব্রীজীয় তত্ত্বটি ব্যাখ্যা করুন।

৩. অর্থে পরিমাণ তত্ত্ব কি?

সমস্যা

ধরুন, একটি দেশের মোট অর্থের যোগান ১২ মিলিয়ন, টাকা, মোট উৎপাদন = ২ মিলিয়ন দামস্তর = ৭ টাকা, এক্ষেত্রে অর্থের গতিবেগ কত? এক্ষেত্রে অর্থের যোগান বৃদ্ধি পেয়ে যদি ১৩ মিলিয়ন টাকা, তাহলে সমান্তরের কি পরিবর্তন হবে?

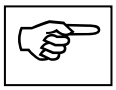

পাঠ ২ : সূচক সংখ্যা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি –

- সূচক সংখ্যা কি তা বলতে পারবেন ;
- সূচক সংখ্যা গঠন করতে পারবেন ;
- সূচক সংখ্যা নির্ণয় করতে পারবেন ;
- ল্যাসপিয়ার্স, প্যাস, ফিশারের সূচক সংখ্যা নির্ণয় করতে পারবেন।

সূচনা

আমরা এর আগের পাঠে অর্থের মূল্য সম্পর্কে আলোচনা করেছি। দ্রব্যের মূল্য পরিবর্তনের ফলে আমাদের ক্রয় ক্ষমতা হ্রাস পায়। একে আমরা অর্থের মূল্য হ্রাস হিসেবে দেখিয়েছি। এই ক্রয় ক্ষমতার যদি পরিবর্তনের বিষয়টির সঠিক পরিমাপ আমরা যদি করতে চাই সেক্ষেত্রে আমাদেরকে এক বছরের মূল্যস্তরের সাথে অন্য বছরের মূল্যস্তরকে সমান পর্যায়ে এনে প্রকাশ করতে হবে। এই সমানভাবে প্রকাশ করার উপায়কেই আমরা সূচক সংখ্যার মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারি। যেমন : ধরুন, ১৯৭৬ সালে এক কেজি চিনির দাম ছিল ১০ টাকা আর এখন এক কেজি চিনির দাম ৩৪ টাকা। এখন যদি আপনাকে দুটো দামের মধ্যে তুলনা করতে হয় তা সূচক সংখ্যার সাহায্যে করা যেতে পারে। এই যে তুলনা করার উপায় এটাই হলো সূচক সংখ্যার মূল শক্তি। এই অধ্যায় আমরা সূচক সংখ্যা কি এবং এর গঠন পদ্ধতিসমূহ নিয়ে আলোচনা করব।

সূচক সংখ্যা কি ?

এক বছরের গড় দামস্তর ওঠানামা তথা অর্থের মূল্য হ্রাস-বৃদ্ধি পরিমাপ করার জন্য যে প্রতীক সংখ্যা ব্যবহার করা হয় তাকে দামস্তরের সূচক সংখ্যা (Price index number)। দামস্তর বা অর্থের মূল্যের পরিবর্তন পরিমাপের উদ্দেশ্যে সূচক সংখ্যা ব্যবহার করা হয়। দামস্তর বাড়লে সূচক সংখ্যা বাড়বে এবং অর্থের মূল্য কমে যাবে। দামস্তর কমলে সূচক সংখ্যা কমবে এবং অর্থের মূল্য বাড়বে।

অধ্যাপক ব্লেয়ার এর মতে "সূচক সংখ্যা হল একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ গড়"।

অধ্যাপক এক্সটন এবং কাউডেন এর মতে "সূচক হলো পারস্পরিক সম্বন্ধযুক্ত কতগুলো বিষয়ের পার্থক্যের ব্যবধান পরিমাপ করার কৌশল।"

একটি অর্থনীতিতে সব কয়টি দ্রব্যের দাম একত্রে বাড়ে বা কমে না। তাই দ্রব্যমূল্যের একটা গড় হিসাব করা হয়। এরূপ গড়পড়তা দামের সমষ্টিকে সূচক সংখ্যা বলা হয়।

সুতরাং দামস্তরের পরিবর্তন সময়ের ব্যবধানে প্রকাশ করার মাধ্যম হল সূচক সংখ্যা।

সূচক সংখ্যা গঠন পদ্ধতি

সূচক সংখ্যা গঠন করতে হলে কতগুলো বিশেষ বিষয়ের উপর নজর রাখতে হয়। নিচে তা উল্লেখ করা হলো :

১. **ভিত্তি বছর :** সূচক সংখ্যা গঠন করতে হলে ভিত্তি বছর ঠিক করে নিতে হয়। যে বছরের সাথে অন্য বছরের দামস্তরের তুলনা করতে হয় তাই হলো ভিত্তি বছর। ভিত্তি বছরকে স্থিতিশীল বছর হতে হবে। যেমন ১৯৭২ সালকে ভিত্তি বছর বলা যাবে না। কারণ এ বছরে দেশ ছিল যুদ্ধবিধ্বস্ত একটি ধ্বংসস্তূপ। দামস্তরসহ প্রায় সকল অর্থনৈতিক চলক স্থিতিশীল ছিল না। তাই ১৯৭৬ সালকে ভিত্তি বছর হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

২. **দ্রব্য বিনিময় :** সূচক সংখ্যা গঠনের জন্য কতগুলো দ্রব্য নির্বাচন করতে হয়। সাধারণত যে সব দ্রব্য মানুষ ভোগ করে সেই সব দ্রব্য বাছাই করতে হবে। সকল প্রকার দ্রব্য নিয়ে সূচক সংখ্যা গঠন করলে জটিলতা সৃষ্টি হবে তাই সঠিক দ্রব্য বেছে নিয়ে সূচক সংখ্যা গঠন করতে হবে।

৩. **দ্রব্যের দাম :** আমরা জানি যে, বাজার ব্যবস্থায় দুটি দাম প্রচলিত আছে। একটি হলো পাইকারী দাম আর অন্যটি হলো খুচরা দাম। কিন্তু সূচক সংখ্যার ক্ষেত্রে পাইকারী দাম ব্যবহার করা হয়।

৪. **আপেক্ষিক দাম নির্ণয় :** ভিত্তি বছর ও চলতি বছরের আপেক্ষিক দাম নির্ণয় করতে হয়। ভিত্তি বছরের দাম ১০০ টাকা ধরে হিসাবী বছরের দাম এর হ্রাস-বৃদ্ধি শতকরা প্রকাশ করা হয়। যেমন ভিত্তি বছরে চালের দাম ৬০ টাকা হলে তাকে আমরা ১০০ টাকা হিসেবে প্রকাশ করব। চলতি বছরের দাম ১২০ হলে ২০০% পরিবর্তন হিসেবে দেখাব ভিত্তি বছরের সাথে তুলনার জন্য।

৫. **আপেক্ষিক গড় দাম নির্ণয় :** ভিত্তি বছরের আপেক্ষিক দামের যোগফলকে দ্রব্যের সংখ্যা দ্বারা ভাগ করে গড় দাম বের করা হয়, এ গড় সর্বদা ১০০ হবে। আর হিসেবী বছরের আপেক্ষিক দামের যোগফলকে দ্রব্য সংখ্যা দ্বারা ভাগ করে গড় সংখ্যা পাওয়া যাবে এটা ১০০ এর চেয়ে বেশি বা কম হবে।

সূচক সংখ্যা নির্ণয় : সূচক সংখ্যা নির্ণয়ের দু'টি পদ্ধতি প্রচলিত আছে।

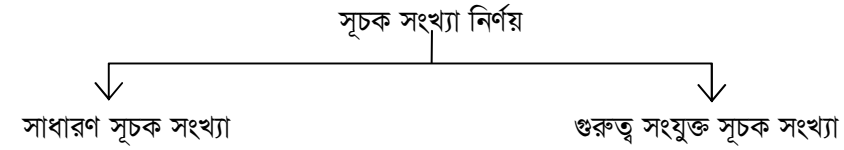

সাধারণ সূচক সংখ্যা : সকল শ্রেণীর দ্রব্যের সমান গুরুত্ব দিয়ে যে সূচক সংখ্যা প্রকাশ করা হয় তাই হলো সাধারণ সূচক সংখ্যা। একটি উদাহরণের মাধ্যমে সাধারণ সূচক সংখ্যাকে প্রকাশ করা হলো যা আপনাদের শেখার ক্ষেত্রে সহায়ক হবে।

	ভিত্তি বছর		চলতি বছর	
দ্রব্য	প্রতি কেজি	আপেক্ষিক দাম	প্রতি কেজি	শতকরা বাড়তি দাম
চিনি	২০	১০০	২৫	১২৫%
চাল	১০	১০০	১৫	১৫০%
তেল	৩০	১০০	৪০	১৩৩%
রসুন	২৫	১০০	৩০	১২০%
	গড় দাম = ৪০০ ÷ ৪ = ১০০		বাড়তি দামস্তর = ৫২৮ ÷ ৪ = ১৩২	

তালিকা অনুযায়ী, ১৯৮০ সালের দামস্তরের সূচক সংখ্যা ছিল ১০০ এবং ১৯৯৮ সালে দামস্তরের সূচক সংখ্যা ছিল ১২৮। দামস্তর শতকরা বেড়েছে = ১২৮-১০০ = ২৮। অর্থাৎ ক্রয় ক্ষমতা ২৮ ভাগ হ্রাস পেয়েছে।

গুরুত্ব সংযুক্ত সূচক সংখ্যা : গুরুত্ব অনুসারে আপেক্ষিক দাম নির্ণয় করে গুরুত্বসংযুক্ত সূচক সংখ্যা বের করা হয়। যে দ্রব্যের গুরুত্ব যত তত দ্বারা গুণ করে সমষ্টিকে গুরুত্বের যোগফল দ্বারা ভাগ করে আমরা গুরুত্বারোপিত সূচক সংখ্যা নির্ণয় করতে পারি।

দ্রব্য	ভিত্তি বছর (১৯৮০ইং)		হিসাবী বছর (১৯৯৪ইং)	
	প্রতি কেজির দাম	আপেক্ষিক দাম (শতকরা হার)	প্রতি কেজির দাম	শতকরা হারে বাড়তি দাম × গুরুত্ব
চাল	১০টাকা	১০০×৪ = ৪০০	১৫ টাকা	১৫০×৪ = ৬০০
ময়দা	৮ টাকা	১০০×৩ = ৩০০	১২ টাকা	১৫০×৩ = ৪৫০
তেল	১৮ টাকা	১০০×২ = ২০০	৩৬ টাকা	২০০×২ = ৪০০
পিয়াজ	৫ টাকা	১০০×১ = ১০০	১০ টাকা	২০০×১ = ২০০
		১০ = ১০০০		১০ = ১৬৫০
	গড় দাম = ১০০০÷১০ = ১০০		বাড়তি দামস্তর = ১৬৫০÷১০ = ১৬৫	

উপরের উদাহরণে পিয়াজের তুলনায় চাল, ময়দা ও তেলের গুরুত্ব যথাক্রমে ৪, ৩, ২ গুণ ধরা হয়েছে এবং চাল, ময়দা, পিয়াজের শতকরা বাড়তি দামকে যথাক্রমে ৪, ৩, ২ এবং ১ দিয়ে গুণ করে বাড়তি দামস্তর নির্ণয় করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, ১৯৮০ সালে মূল্যস্তরের সূচক সংখ্যা ছিল ১০০। ১৯৯৪ সালের সূচক সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১৬৫। অর্থাৎ ১৯৮০ থেকে ১৯৯৪ সালের মধ্যে দামস্তর বেড়েছে ১৬৫-১০০ = ৬৫ ভাগ হারে।

সুতরাং সাধারণ সূচক সংখ্যার চেয়ে গুরুত্ব আরোপিত সূচক সংখ্যা দ্বারা দামস্তরের পরিবর্তন সঠিকভাবে জানা যায়।

সূচক সংখ্যা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে যে কয়েকটি পদ্ধতি বিশেষভাবে ব্যবহার করা হয় তার মধ্যে লেসপিয়ার্স, প্যাস, ফিশারের সূচক সংখ্যা উল্লেখযোগ্য।

লেসপিয়ার্স সূচক সংখ্যা : ল্যাসপিয়ার্স সূচক সংখ্যা হলো ভারারোপিত সূচক সংখ্যা। এই সূচক সংখ্যায় ভিত্তি বছরের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। ল্যাসপিয়ার্সের সূচক সংখ্যার সূত্র হলো :

$$P_L^n = \frac{\sum p_n q_o}{\sum p_o q_o}$$

p_n = চলতি বছরের দ্রব্য মূল্য

p_o = ভিত্তি বছরের দ্রব্য মূল্য

q_o = ভিত্তি বছরের দ্রব্যের পরিমাণ

দ্রব্য	ভিত্তি বছর		চলতি বছর	
দ্রব্য	দাম, p_o	পরিমাণ, q_o	দাম, p_n	পরিমাণ, q_n
চাল	১০ টাকা	২০	১২ টাকা	২০
তেল	৩০ টাকা	১৫	৩৫ টাকা	১৫
লবণ	১০ টাকা	১০	১২ টাকা	১০
পিয়াজ	১২ টাকা	৭	১০ টাকা	৭

সূচী - ১

তাহলে ল্যাসপিয়ার্সের সূচক সংখ্যা হবে –

$\Sigma p_o q_o$ = ১০×২০ + ৩০×১৫ + ১০×১০ + ১২×৭

= ২০০ + ৪৫০ + ১০০ + ৮৪

= ৮৩৪

$$\Sigma p_n q_o = ১২\times১০ + ৩৫\times১৫ + ১২\times১০ + ৭\times১০$$
$$= ১২০ + ৫২৫ + ১২০ + ৭০$$
$$= ৮৩৫$$

$$\text{সুতরাং } p_L^n = \frac{\sum p_n q_o}{\sum p_o q_o}\times১০০$$
$$= \frac{৮৩৫}{৮৩৪}\times১০০$$

ল্যাসপিয়ার্স সূচক সংখ্যায় ভিত্তি বছরের দ্রব্যের পরিমাণকে গুরুত্ব হিসাবে ব্যবহার করা হয় বলে এ সূচক সংখ্যার নিম্নমূখী প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়।

প্যাসের সূচক সংখ্যা : প্যাসের সূচক সংখ্যায় চলতি বছরের দ্রব্যের পরিমাণের উপর গুরুত্ব আরোপ করে। প্যাসের মতে

$$p_p^n = \frac{\sum p_n q_n}{\sum p_o q_n}\times 100$$

এখানে, p_n = চলতি বছরের দ্রব্যমূল্য
q_n = চলতি বছরের দ্রব্যের পরিমাণ
p_o = ভিত্তি বছরের দ্রব্যমূল্য

$$\Sigma p_o q_n = ১২ \times ২০ + ৩৫ \times ২৫ + ১২ \times ১০ + ১০ \times ৭$$
$$= ২৪০ + ৫২৫ + ১২০ + ৭০$$
$$= ৯৫৫$$

$$\Sigma p_o q_n = ১০ \times ২০ + ৩০ \times ২৫ + ১০ \times ১০ + ১২ \times ৭$$
$$= ২০০ + ৪৫০ + ১০০ + ৮৪$$
$$= ৮৩৪$$

$$p_p^o = \frac{৯৫৫}{৮৩৪}\times১০০ = ?$$

আর প্যাসের সূচক সংখ্যায় চলতি বছরের উপর বেশী গুরুত্বারোপ করা হয় বলে এর উর্ধ্বমুখী প্রবণতা লক্ষ করা যায়।
কাজেই, উপরোক্ত দু'ধরনের সূচক সংখ্যাই দ্রব্যমূল্যের পরিবর্তনকে সঠিকভাবে তুলে ধরতে পারে না।

এই অসুবিধা দূর করার জন্য ফিশারের সূত্রটি ব্যবহার করা হয় –

ফিশারের সূত্র : ফিশারের সূচক সংখ্যায় ল্যাসপিয়ার্স ও প্যাসের সূত্রের সমন্বয় করা হয়েছে। ফিশারের সূচক সংখ্যাটিকে আদর্শ সূচক সংখ্যা বলা হয়। ফিশারের সূচক সংখ্যাটি হলো –

$$p_F = \sqrt{\frac{\sum p_q q_o}{\sum p_o q_o} \times \frac{\sum p_q q_u}{\sum p_o q_u}} \times ১০০$$

এখানে

p_o = ভিত্তি বছরের দাম স্তর
p_n = চলতি বছরের দাম স্তর
q_o = ভিত্তি বছরের দ্রব্যের পরিমাণ
q_n = চলতি বছরের দ্রব্যের পরিমাণ

এখন উপরের সরণীর মানগুলো ব্যবহার করে আমরা পাই,

$$p_F = \sqrt{\frac{৮৩৫}{৮৩৪} \times \frac{৯৫৫}{৮৩৪}} \times ১০০$$

$\Sigma p_o q_o$ = ৮৩৪
$\Sigma p_q q_o$ = ৮৩৫
$\sum p_o q_n$ = ৯৫৫
$\sum p_o q_n$ = ৮৩৪

তাই আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে, সূচক সংখ্যাগুলোর মধ্যে ফিশারের সূচক সংখ্যাটি থেকে তুলনামূলকভাবে ভাল ফল দিচ্ছে। এটি অনেকটা উর্ধ্বমুখীতা বা নিম্নমুখীতার দোষমুক্ত।

১. নিচে চারটি দ্রব্যের দাম ও পরিমাণ (চলতি ও ভিত্তি বছরের) উল্লেখ করা হলো :

	চলতি বছর		ভিত্তি বছর	
দ্রব্য	দাম	পরিমাণ	দাম	পরিমাণ
চাল	১০	২০	৮	২০
তেল	৫০	২	৪৫	১
রশুন	১০০	১	৭০	১
পিয়াজ	১৫	৫	১০	৪

উপরোক্ত তথ্য থেকে আপনি কি সাধারণ সূচক সংখ্যা, ল্যাসপিয়ার্স, প্যাস ও ফিশারের সূচক সংখ্যা বের করুন।

২. সূচক সংখ্যা কাকে বলে? সূচক সংখ্যা গঠন পদ্ধতিসমূহ আলোচনা করুন।
৩. সাধারণ সূচক সংখ্যা ও ভারারোপিত সূচক সংখ্যা ব্যাখ্যা করুন।

পাঠ ৩ : মুদ্রাস্ফীতির প্রকারভেদ, কারণ ও ফলাফল

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি –

- মুদ্রাস্ফীতি কি তা বলতে পারবেন ;
- মুদ্রাস্ফীতির প্রকারভেদ বর্ণনা করতে পারবেন ;
- মুদ্রাস্ফীতির কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবেন ;
- মুদ্রাস্ফীতির ফলাফল বর্ণনা করতে পারবেন।

ভূমিকা

মুদ্রাস্ফীতি অর্থনীতির একটি ব্যাধি। মুদ্রাস্ফীতির ফলে অর্থের ক্রয় ক্ষমতা হ্রাস পায়। যার ফলে আমরা বাজারে গিয়ে কাঙ্ক্ষিত দ্রব্য ক্রয় করতে বেশি পরিমাণ টাকা খরচ করতে হয়। যেমন ধরুন, আপনি ১ বছর আগে বাজারে গিয়ে দেখেছেন যে একটি দ্রব্যের মূল্য ছিল ১০ টাকা। কিন্তু এক বছর পর আপনি দেখলেন, সেই দ্রব্যটির মূল্য ১২ টাকা হয়ে গেছে। এই যে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি – একেই আমরা সহজ কথায় মুদ্রাস্ফীতি বলি। আমরা এই পাঠে মুদ্রাস্ফীতির সংজ্ঞা, মুদ্রাস্ফীতির কারণ ও একটি দেশের অর্থনীতিতে মুদ্রাস্ফীতির প্রভাব সম্পর্কে জানব।

মুদ্রাস্ফীতির সংজ্ঞা

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মুদ্রাস্ফীতি একটি অত্যন্ত আলোচিত বিষয়। সাধারণতঃ মুদ্রাস্ফীতি বলতে দ্রব্যমূল্যের বৃদ্ধিকে বুঝায়। কিন্তু ক্ষণস্থায়ী দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিকে মুদ্রাস্ফীতি বলা যায় না। তাহলে মুদ্রাস্ফীতি আসলে কি? আসলে মুদ্রাস্ফীতি হলো সময়ের ব্যবধানে দ্রব্যমূল্যের ক্রমাগত বৃদ্ধি। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় আমরা কম পরিমাণ দ্রব্য একই টাকায় কিনতে পারি। ফলে অর্থের ক্রয় ক্ষমতা হ্রাস পায়। অর্থাৎ "মুদ্রাস্ফীতির ফলে অর্থের মূল্যে ক্রমাগত হ্রাস পায়।" বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ বিভিন্নভাবে মুদ্রাস্ফীতির সংজ্ঞা দিয়েছেন।

অর্থনীতিবিদ কেমারার (kemerer) এর মতে, "যখন দেশে মোট মুদ্রার যোগান চাহিদার তুলনায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে পণ্যসামগ্রীর দাম বৃদ্ধি করে তখন মুদ্রাস্ফীতি ঘটে।" অর্থনীতিবিদ পল আইন জিন এর মতে "মুদ্রাস্ফীতি" হল ক্রয় ক্ষমতার প্রসারমুখী গতি যা দামস্তরে বৃদ্ধি ঘটায়।" অর্থনীতিবিদ কুলবর্ণ এর মতে "মুদ্রাস্ফীতি হল এইরূপ একটি পরিস্থিতি যেখানে অত্যধিক পরিমাণ অর্থ অতি সামান্য পরিমাণ দ্রব্য-সামগ্রীর পশ্চাতে ধাবিত হয়।" অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক পিলুর মতে "যখন আয় অধিক হারে বৃদ্ধি পায় তখনই মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়।"

সুতরাং "মুদ্রাস্ফীতি" হলো দেশে প্রচলিত দ্রব্যসামগ্রীর ক্রয়ের জন্য যে পরিমাণ অর্থের দরকার হয় তার চেয়ে যদি বেশি মুদ্রার যোগান অর্থনীতিতে প্রচলিত থাকে যা দ্রব্যমূল্যকে ক্রমাগত হারে বাড়ায় ঠিক সেই অবস্থা। অবশ্য দেশে অর্থের যোগান বাড়লেই যে মুদ্রাস্ফীতি হয় এমনটা বলা যাবে না। লর্ড কেইনসের মতে – পূর্ণ নিয়োগ স্তরের পূর্ব পর্যন্ত সত্যিকারের মুদ্রাস্ফীতি ঘটতে পারে না। যতদিন পর্যন্ত দেশে প্রচুর পরিমাণে অব্যবহৃত সম্পদ থাকে ততদিন অর্থের যোগান বাড়লে দেশে বাড়তি বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেয়ে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে। ফলে আয় ও উৎপাদন বাড়বে। তাই মূল্যের বৃদ্ধি ঘটে না। কিন্তু কোন সময় যোগানের অসুবিধা থাকলে আংশিক মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিতে পারে, তবে সাধারণতঃ পূর্ণ নিয়োগস্তরের পূর্বে সত্যিকার মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয় না।

মুদ্রাস্ফীতির গাণিতিক বহিঃপ্রকাশকে নিম্নোক্তভাবে লেখা যেতে পারে ঃ

$$t \text{ বছরের মুদ্রাস্ফীতির হার} = \frac{t \text{ বছরের দামস্তর} - t\text{-}1 \text{ বছরের দামস্তর}}{t\text{-}1 \text{ বছরের দামস্তর}} \times ১০০$$

$$\frac{p_t - p_{t-1}}{p_{t-1}} \times ১০০$$

এখানে, p_t = বর্তমান বছরের দ্রব্যমূল্য
p_{t-1} = ভিত্তি বছরের দ্রব্যমূল্য

যেমন ধরুন একটি দ্রব্যের দাম ১৯৮০ সালে ছিল ১০ টাকা। ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পেয়ে সেই জিনিসটির দাম ২০০০ সালে হয়েছে ১৫ টাকা। তবে মুদ্রাস্ফীতির হার হবে

এখন ২০০০ সালে মুদ্রাস্ফীতির হার $= \frac{p_{00} - p_{80}}{p_{80}} \times ১০০$

$= \frac{১৫ - ১০}{১০} \times ১০০$

$= \frac{৫}{১০} \times ১০০$

$= ৫০$

অতএব ২০০০ সালে মুদ্রাস্ফীতির হার ৫০%।

অনুশীলনী

ধরুন এক কেজি চিনির দাম ১৯৯০ সনে ছিল ৩০ টাকা। আর সেই চিনির দাম ১৯৯৮ হয়েছে ৩৪ টাকা। ১৯৯৮ সনে মুদ্রাস্ফীতির হার কত ছিল এবং কোন ধরনের মুদ্রাস্ফীতি ?
একটা দেশে মুদ্রাস্ফীতির কতটুকু কাম্য তা সেদেশের অর্থনীতির উপর নির্ভর করে। আমাদের দেশে ৫% পর্যন্ত মুদ্রস্ফীতিকে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচনা করা হয়।

মুদ্রাস্ফীতির প্রকারভেদ :

এতক্ষণ আমরা মুদ্রাস্ফীতির সংজ্ঞাগত দিক বিবেচনা করেছি। এখন আমরা মূল্যস্তরের বৃদ্ধির হারের উপর নির্ভর করে মুদ্রাস্ফীতিকে দিক দিয়ে কয়েকটিভাবে ভাগ করব :

১. **হামাগুড়ি (Creeping inflation) :** মুদ্রাস্ফীতির হার ২% এর কম হলে আমরা একে হামাগুড়ি বা ধীর চলা মুদ্রাস্ফীতি বলতে পারি। বাংলাদেশে ১৯৯২-৯৩ সালের এবং ১৯৯৩-৯৪ সালের মুদ্রাস্ফীতি ছিল যথাক্রমে ১.৪% এবং ২%-একে আমরা Creeping inflation বলতে পারি।

২. **Walking inflation :** মুদ্রস্ফীতি বৃদ্ধির হার যদি ৮-১০% হয় একে আমরা walking inflation বলতে পারি।

Walking এবং creeping inflation কে আমরা স্বাভাবিক (moderate) মুদ্রাস্ফীতি বলতে পারি।

৩. **ধাবমান মুদ্রাস্ফীতি (Running inflation) :** মুদ্রাস্ফীতির হার যদি দুই বা তিন সংখ্যার L অর্থাৎ ২০%, ৫০% বা ১০০%) হয় তবে তাকে আমরা ধাবমান বা Running inflation বলি। ১৯৭০ থেকে ১৯৮০ সাল পর্যন্ত আর্জেন্টিনা ও ব্রাজিলের মুদ্রাস্ফীতির হার ছিল ৫০% থেকে ৭০০% এর মধ্যে।

৪. **আকাশচুম্বী মুদ্রাস্ফীতি (Hyper inflation) :** যখন ক্রয় ক্ষমতা প্রায় শূন্যের কাছাকাছি চলে যায়, তখন তাকে আমরা Hyper inflation বলি। ১৯২২ এর জানুয়ারি থেকে ১৯২৩ সালের নভেম্বর পর্যন্ত মুদ্রাস্ফীতির হার ছিল ১ থেকে ১০,০০০,০০০,০০০। যার ফলে ক্রয় ক্ষমতা হ্রাস পেয়ে প্রায় শূন্যের কাছাকাছি চলে আসে। বিভিন্ন ধরনের মুদ্রাস্ফীতিকে নিচের চিত্রের সাহায্যে দেখানো হলো :

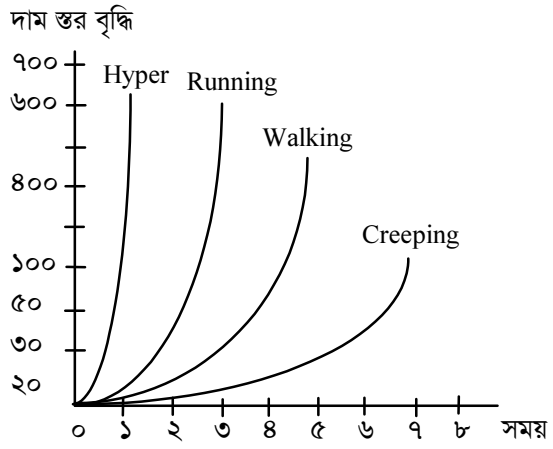

চিত্র : মুদ্রাস্ফীতির প্রকারভেদ।

অনুশীলন

কয়েকটি মুদ্রাস্ফীতির হলো ৫%, ১০%, ১০০% ৫০০%। এদের কোন্‌টি কোন্ ধরনের মুদ্রাস্ফীতি নির্দেশ করুন?

মুদ্রাস্ফীতির কারণ

এত সময় আমরা মুদ্রাস্ফীতি কি ও এর ধরন ও প্রকারভেদ নিয়ে আলোচনা করেছি। স্বাভাবিকভাবেই এখন প্রশ্ন আসতে পারে মুদ্রাস্ফীতি কেন ঘটে ? এর বহুবিধ কারণ আছে। নিম্নে প্রধান প্রধান কারণগুলো আলোচনা করা হলো :

১. **অর্থের যোগান বৃদ্ধি :** মুদ্রাস্ফীতির প্রধান কারণ হলো অর্থের যোগান বৃদ্ধি। অর্থের যোগান বৃদ্ধি পেলে দামস্তর বাড়ে কারণ অর্থের যোগান বাড়া এবং দ্রব্যের যোগান বাড়ার মধ্যে সব সময় সমতা রক্ষা সম্ভব হয় না। কিন্তু পূর্ণ নিয়োগ স্তরের পূর্বে অর্থের যোগান বাড়লে সাধারণতঃ দামস্তর বৃদ্ধি স্থায়ী হয় না। কিন্তু পূর্ণ নিয়োগ স্তরে অর্থের যোগান বাড়লে দামস্তর বৃদ্ধি স্থায়ীভাবে পায়।

২. **সরকারের অতিরিক্ত ব্যয় :** সরকার সাধারণতঃ আয় অপেক্ষা ব্যয় বেশি করে। সরকার যদি জনসাধারণের কাছ থেকে ঋণের মাধ্যমে তা গ্রহণ করে তবে মুদ্রাস্ফীতির সম্ভাবনা থাকে না, কিন্তু যদি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট থেকে ঋণ গ্রহণ করে বা বৈদেশিক উৎস থেকে ঋণ গ্রহণ করে এবং দেশের অভ্যন্তরে উহা খরচ করে তবে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিতে পারে।

৩. **বাণিজ্যিক ব্যাংক কর্তৃক অধিক ঋণ দান :** দেশের অর্থের যোগান যদি বৃদ্ধি পায় তবে ব্যাংকের সঞ্চয়ের পরিমাণ বাড়বে এবং ব্যাংকসমূহ ঋণ দিতে উদ্বুদ্ধ হবে। ঋণদান ব্যবস্থা সহজ হলে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিতে পারে।

৪. **অর্থের প্রচলন গতি :** অর্থের প্রচলন গতি বাড়লে দামস্তর বাড়বে। ভোগ প্রবণতা কমলে অর্থের প্রচলন গতি বাড়ে এবং মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টি হয়।

৫. **দামস্তর বৃদ্ধির প্রত্যাশা :** দাম বাড়বে এ প্রত্যাশা করলে চাহিদা বেড়ে মুদ্রাস্ফীতিকে ত্বরান্বিত করে। অথবা ভবিষ্যত আয় বা মজুরী বাড়বে এই প্রত্যাশা করলে ব্যবসায়ীগণ দামস্তর বাড়াতে পারে বা বিদেশে দ্রব্যের চাহিদা বাড়বে এই আশা করে মূল্যস্তর বাড়াতে পারে।

৬. **যুদ্ধের ব্যয় :** যুদ্ধের ব্যয় নির্বাহের জন্য সরকারের প্রচুর অর্থের দরকার হয়। এই ব্যয় মিটানের জন্য সরকার কাগজী নোট ছাপিয়ে এই অর্থ অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যয় হয় ফলে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়।

৭. **প্রাকৃতিক দুর্যোগ :** প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হলে উৎপাদন হ্রাস পায় এবং অর্থের যোগান নির্দিষ্ট পরিমাণে থাকলে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়।

৮. **উৎপাদন ব্যয় :** উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পেলে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিতে পারে। উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি সাধারণতঃ ঘটে উৎপাদনের উপাদানের ঘাটতি, মজুরি বৃদ্ধি ও খাজনা বৃদ্ধি পেলে যা মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়।

৯. **শ্রমের প্রভাব :** শ্রমিক সংঘ অনেক সময় মজুরি বৃদ্ধির করার জন্য চাপ দেয় যার ফলে মজুরি বৃদ্ধি করতে হয়। এতে উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পায়। যা দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি করে।

১০. **চোরাচাল ও মজুতদারী :** কালোবাজারী ও চোরাচালান ইত্যাদি দুর্নীতিপরায়ণ কাজের জন্য কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি হয় যা যোগান সংকট সৃষ্টি করে মূল্যস্তরকে বাড়ায়।

ফলাফল

মুদ্রাস্ফীতি একটি মন্দ ধারণা বলে পরিচিত। আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশে মুদ্রাস্ফীতির প্রভাব কম। যেমন ধরুন, বাজার মূল্য ১০% হারে বেড়েছে এবং আপনার বেতন বা মজুরিও একই অনুপাতে বেড়েছে। তবে সে ক্ষেত্রে মুদ্রাস্ফীতির কোন প্রভাব পড়বে না। যে অবস্থাটাকে বিশুদ্ধ (Pure inflation) মুদ্রাস্ফীতির বেলায় দেখা যায়। বাস্তবে এ অবস্থা অনুপস্থিত। মুদ্রাস্ফীতি আসলে নানা রকম প্রভাব ফেলে। চলুন এগুলো জেনে নেয়া যাক :

১. **উৎপাদনকারীর উপর প্রভাব :** দামস্তর বৃদ্ধির ফলে অর্থাৎ অর্থের মূল্য হ্রাস পেলে উৎপাদনকারী লাভবান হয়। এতে উৎপাদিত দ্রব্য অধিক মূল্যে বিক্রি করে অধিক আয়, মুনাফা ও সঞ্চয় করতে সক্ষম হয়। বিনিয়োগ বৃদ্ধির ফলে নতুন কর্মসংস্থান ও উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে। এর ফলে কৃষি ও শিল্প ক্ষেত্রে উৎপাদন বাড়বে।

২. **ভোগকারীদের উপর প্রভাব :** মুদ্রাস্ফীতির ফলে ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পায়। এতে ক্রেতা সমপরিমাণ টাকা দিয়ে কম পরিমাণ দ্রব্য পায়। যার ফলে ক্রয় ও ভোগের পরিমাণ হ্রাস পায়। এর ফলে জীবনযাত্রার মান ও কর্মক্ষমতা হ্রাস পায় এবং এতে জীবনে অভাব-অনটন, রোগ-শোক, অশান্তি নেমে আসে।

৩. **ঋণদাতা ও গ্রহীতার উপর প্রভাব :** দামস্তর বাড়লে বা অর্থের মূল্য কমলে ঋণদাতা ক্ষতিগ্রস্ত এবং ঋণ গ্রহীতা লাভবান হবে। যদিও একই পরিমাণ অর্থ দ্বারা ঋণ পরিশোধ

হয় তবুও পূর্বের তুলনায় ঋণ পরিশোধকালে অর্থের ক্রয় ক্ষমতা কম থাকে। দ্রব্যের আকারে কম পরিমাণ দিয়ে ঋণ পরিশোধ করায় ঋণ গ্রহীতা লাভবান হয়।

৪. **শ্রমিক ও সীমিত আয়ের লোকের উপর প্রভাব :** শ্রমিক, বেতনভুক্ত কর্মচারী ও সীমিত আয়ের লোকেরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মুদ্রাস্ফীতি বাড়লে মজুরি বাড়বে না। ফলে তাদের নির্দিষ্ট আয় দিয়ে কম পরিমাণ দ্রব্য কিনতে পারে। যা তাদের ভোগ, ক্রয় ও জীবনযাত্রার মান কমায়।

৫. **করদাতা ও কর গ্রহীতার উপর প্রভাব :** মুদ্রাস্ফীতির ফলে অর্থের মূল্য হ্রাস পাওয়ায় কর দাতা সুবিধা এবং কর গ্রহীতার অসুবিধা হয়। স্বল্প পরিমাণ দ্রব্য বিক্রি করে করদাতা কর দিতে পারে এবং কর গ্রহীতা কম পরিমাণ দ্রব্য কিনতে পারে উক্ত টাকা দ্বারা।

৬. **কৃষকের উপর প্রভাব :** মুদ্রাস্ফীতির ফলে কৃষক লাভবান হয় এবং সে তার উৎপাদিত দ্রব্য বিক্রি করে বেশি পরিমাণ দামে বিক্রি করলে আয়, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ বেশি হবে।

৭. **বৈদেশিক বাণিজ্যের উপর প্রভাব :** দামস্তর বাড়লে রপ্তানীজাত দ্রব্যের দাম বাড়বে। ফলে রপ্তানী কমবে এবং আমদানী বাড়বে। ফলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে প্রতিকূল অবস্থা বিরাজ করবে।

৮. **আয় বন্টনের প্রভাব :** মুদ্রাস্ফীতির ফলে আয়ের অধিকাংশ অংশ উৎপাদনকারী, বিনিয়োগকারী এবং ব্যবসায়ীদের নিকট জমা হবে। যার ফলে সামাজিক ভারসাম্য নষ্ট ও সমাজে শান্তি বিঘ্নিত হবে।

৯. **বিনিয়োগকারীর উপর প্রভাব :** মুদ্রাস্ফীতির ফলে অর্থের মূল্য হ্রাস পাওয়ায় ঋণপত্র বা বন্ড ক্রেতা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কিন্তু কোম্পানির শেয়ারে বিনিয়োগকারীগণ লাভবান হবে। কারণ শেয়ারের মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে।

১০. **অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির উপর প্রভাব :** অর্থের মূল্য হ্রাস পেলে সাধারণতঃ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত হয়। কারণ এতে সমাজের আয়, নিয়োগ, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পায় যা অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সহায়ক।

মুদ্রাস্ফীতির অনেক কুফলও আছে। তাই লর্ড কেইন বলেন "মুদ্রাস্ফীতি অন্যায়", তাই দরকার স্থিতিশীল অর্থনৈতিক অবস্থা। যা হতে পারে সুস্থিতিশীলতা, ভারসাম্য উৎপাদন ও অন্যান্য কাঙ্ক্ষিত উপাদান।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

১। হামাগুড়ি মুদ্রাস্ফীতি কি?
২। অর্থের যোগান বাড়লে কি ঘটে?
৩। চোরাচালানী মুদ্রাস্ফীতির সাথে কি সম্পর্কযুক্ত?
৪। মুদ্রাস্ফীতি করদাতার উপর কি প্রভাব ফেলে?
৫। মুদ্রাস্ফীতি অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপর কি প্রভাব ফেলে?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। মুদ্রাস্ফীতি কি কি কারণে ঘটে ?
২। মুদ্রাস্ফীতি প্রতিকারের উপায় কি কি ?
৩। মুদ্রাস্ফীতি কয় ধরনের ?

সমস্যা

কয়েক ধরনের দ্রব্য নির্বাচন করে মুদ্রস্ফীতি বের করুন। বাংলাদেশের মুদ্রাস্ফীতি কোন ধরনের? প্রতিকারের জন্য কি কি দরকার।

পাঠ — ৪ : মুদ্রাস্ফীতি প্রতিকারের উপায়

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি –

- মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের আর্থিক পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবেন ;
- মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের রাজস্ব পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবেন ;
- মুদ্রাস্ফীতির প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে বলতে পারবেন।

এর আগে আমরা মুদ্রাস্ফীতির প্রকারভেদ, কারণ ও ফলাফল নিয়ে আলোচনা করেছি। মুদ্রাস্ফীতির অনেকগুলো সুফল ও কুফল আমাদের চোখে পড়েছে। তাই মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের কিছু কিছু পদক্ষেপ নেওয়া দরকার। মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের সম্ভাব্য পদক্ষেপগুলি নিম্নের ছকে দেখানো হলো :

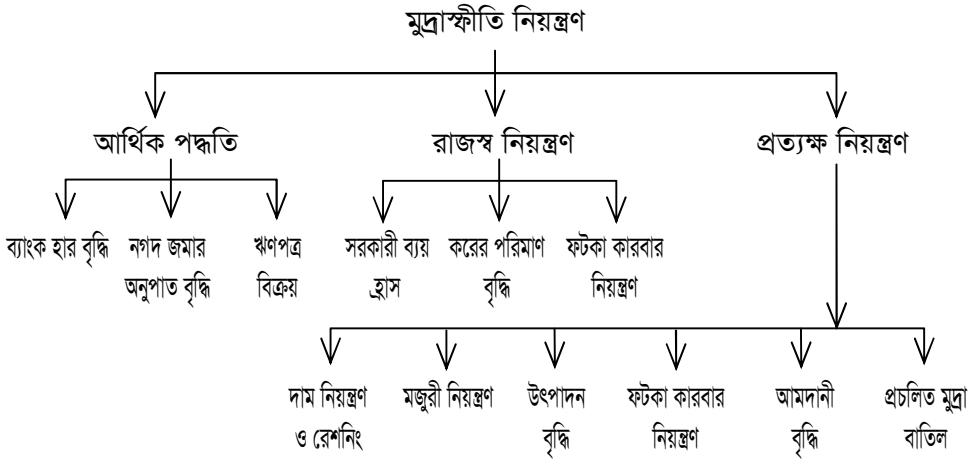

আর্থিক পদ্ধতি

মুদ্রাস্ফীতির মূল কারণ হলো অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি। সুতরাং মুদ্রাস্ফীতি কমাতে হলে অর্থের পরিমাণ কমাতে হবে। অর্থের পরিমাণ কমাতে হলে ব্যাংক ঋণের পরিমাণ কমাতে হবে। কারণ ব্যাংক ঋণ অর্থের পরিমাণ বাড়ায়। তাই ব্যাংক ঋণ ও অর্থের যোগান কমানোই হলো মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের অন্যতম উপায়। তাই মুদ্রাস্ফীতি রোধের জন্য এই পদ্ধতিসমূহ কেন্দ্রীয় ব্যাংক গ্রহণ করে।

১. **ব্যাংক হার বৃদ্ধি :** কেন্দ্রীয় ব্যাংক যে হারে বাণিজ্যিক ব্যাংককে ঋণ দেয় তাকে বলে ব্যাংক হার। ব্যাংক হার বাড়ালে বাণিজ্যিক ব্যাংকে সুদের হার বাড়িয়ে দেয়। এতে বিনিয়োগ ঋণ ও ভোগ ঋণের পরিমাণ কমে যাবে।

২. **নগদ জমার অনুপাত বৃদ্ধি :** কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্দেশে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর নগদ জমার অনুপাত বাড়ালে বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণ দানের পরিমাণ কমে যায়।

৩. **ঋণপত্র বিক্রি :** সরকার খোলা বাজার কার্যক্রমের মাধ্যমে ঋণপত্র বিক্রয় করে জনসাধারণের নিকট নগদ অর্থ তুলে নিতে পারে। নগদ অর্থ কমে যাওয়ার ফলে ঋণদান ক্ষমতা কমে যায়।

৪ **নির্বাচনমূলক ঋণ নিয়ন্ত্রণ :** এ পদ্ধতির মাধ্যমে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করা যায়। এ ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে ঋণ না দেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংককে নির্দেশ দেয়।

রাজস্ব পদ্ধতি

আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকারী ব্যয় ব্যবস্থার চেয়ে মুদ্রা ব্যবস্থা অধিক গুরুত্বপূর্ণ। এ কথা সর্বপ্রথম বলেছেলন লর্ড কেইনস। তাই মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করতে হলে সরকারী ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করা দরকার। তাই রাজস্ব পদ্ধতির মাধ্যমে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করা হয়। রাজস্বনীতির উপাদান হল :

১. **সরকারী ব্যয় হ্রাস :** মুদ্রাস্ফীতির আসল কারণ হলো সরকারের অতিরিক্ত ব্যয়। দেশে যখন মুদ্রাস্ফীতির পরিমাণ বাড়ে তখন সরকারকে তুলনামূলকভাবে কম গুরুত্বপূর্ণ খরচ বাদ দিতে হয়। এবং সম্ভব হলে সরকার সমতা বাজেট বা উদ্বৃত্ত বাজেট অবলম্বন করতে হয়।

২. **করের পরিমাণ বৃদ্ধি :** মুদ্রাস্ফীতি রোধের জন্য সরকারী ব্যয়ের সাথে সাথে বেসরকারী ব্যয়ও হ্রাস করতে হয়। জনসাধারণের উপর আরোপিত করের মাত্রা বৃদ্ধি এবং নতুন নতুন কর আরোপ করলে জনসাধারণের ব্যয়যোগ্য অর্থের পরিমাণ কমে যাবে। রপ্তানী শুল্ক বৃদ্ধি এবং আমদানী শুল্ক হ্রাসের মাধ্যমে বাজারে দ্রবের যোগান বাড়ানো যায়। ফলে মুদ্রাস্ফীতির প্রভাব কমবে।

৩. **সরকারী ঋণ :** করের হার বৃদ্ধির পরও জনসাধারণের নিকট বাড়তি ব্যয়যোগ্য অর্থ থাকতে পারে। এক্ষেত্রে সরকার বিভিন্ন মেয়াদী ঋণ গ্রহণ করে বাড়তি ক্রয় ক্ষমতা হ্রাস করতে পারে।

৪. **সঞ্চয় বৃদ্ধি :** সুদের হার বৃদ্ধি এবং প্রচারাভিযান জোরদার করলে জনসাধারণের মধ্যে সঞ্চয় প্রবণতা বাড়বে। প্রয়োজনবোধে সরকার বাধ্যতামূলক সঞ্চয় চালু করে জনসাধারণের নিকট থেকে অর্থ সংগ্রহ করতে পারে।

প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ

উপরে আপনি আর্থিক পদ্ধতি ও রাজস্ব পদ্ধতির মাধ্যমে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের কথা জেনেছেন। তাছাড়াও অন্য একটি পদ্ধতিতে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে তা হলো প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ। নিম্নের পদক্ষেপগুলোর মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে মুদ্রাস্ফীতিকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় :

১. **দাম নিয়ন্ত্রণ ও রেশনিং :** মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকার দ্রব্য মূল্যের সর্বোচ্চসীমা বেধে দিতে পারে এবং ভোগ্যপণ্য সরবরাহ ও রেশনিং ব্যবস্থা চালু করতে পারে।

২. **মজুরি নিয়ন্ত্রণ :** মুদ্রাস্ফীতির সময়ে শ্রমিকরা বেশি মজুরি পেতে চায়। এতে উৎপাদন ব্যয় এবং উৎপাদন খরচ বাড়ে। এক্ষেত্রে সরকার আইন করে মজুরি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

৩. **উৎপাদন বৃদ্ধি :** উৎপাদনের সল্পতার কারণে মুদ্রাস্ফীতি ঘটে। তাই ব্যবহৃত সম্পদের উৎকৃষ্ট ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হবে। অপ্রয়োজনীয় এবং

কম উৎপাদন ক্ষেত্রে হতে সম্পদ প্রয়োজনীয় ক্ষেত্র স্থানান্তর করে উৎপাদন বাড়ানো যেতে পারে।

৪. **ফটকা কারবার নিয়ন্ত্রণ :** মুদ্রস্ফীতিতে ফটকা কারবার বাড়ে এবং এতে মূল্যস্তরও বাড়ে। ফটকা কারবার নিয়ন্ত্রণের উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করলে দামস্তর হ্রাস পাবে।

৫. **আমদানী বৃদ্ধি :** চাহিদার তুলনায় যোগান খুব কম হলে বাজারের চাহিদা আমদানী দ্বারা মিটানো যায়। এর মাধ্যমে যোগান বাড়ানো মাধ্যমে দাম কমানো যাবে।

৬. **প্রচলিত মুদ্রা বাতিল :** বিভিন্ন পন্থায় মুদ্রাস্ফীতি রোধ করা না গেলে সরকার প্রচলিত নোট বাতিল করে দিতে পারে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মানী এবং স্বাধীনতার পর বাংলাদেশে কিছু প্রচলিত নোট বাতিল করা হয়েছে।

এই সব পদ্ধতি যৌথভাবে প্রয়োগ করলে মুদ্রস্ফীতি রোধ করা যায়। কিন্তু এককভাবে কোন পদ্ধতি প্রয়োগ করলে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হয় না। তাই মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য যুগপৎভাবে রাজস্ব পদ্ধতি, আর্থিক পদ্ধতি ও প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি প্রয়োগ করতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১। আর্থিক পদ্ধতি অনুসারে মুদ্রাস্ফীতি উপাদান কয়টি ?
ক. ৫ ; খ. ৪ ; গ. ৭ ; ঘ. ৩

২। সরকারী ঋণ মুদ্রাস্ফীতিকে কি করে ?
ক. কমায় ; খ. বাড়ায় ; গ. কিছুই করে না ; ঘ. উপরের সবগুলো

৩। রাজস্বনীতি অনুযায়ী মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের উপায় কয়টি ?
ক. ৫ ; খ. ৩ ; গ. ৪ ; ঘ. ১

৪। করের পরিমাণ বাড়ালো মুদ্রাস্ফীতিতে কি ঘটে ?
ক. কমে ; খ. বাড়ে ; গ. নিয়ন্ত্রণে আসে ; ঘ. কিছুই ঘটে না

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর

১। রাজস্বনীতি অনুসারে মুদ্রাস্ফীতি প্রতিকারের উপায় লিখুন।

২। প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ মুদ্রাস্ফীতিকে নিয়ন্ত্রণের উপর কি প্রভাব মেলে ?

৩। রাজস্বনীতির সাহায্যে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ আলোচনা করুন।

সমস্যা

১। বাংলাদেশের মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য কি কি করণীয় তা বলুন ও লিখুন।

পাঠ — ৫ : বাংলাদেশে মুদ্রাস্ফীতির কারণ এবং অর্থনীতিতে এর প্রভাব

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি –

- বাংলাদেশে মুদ্রাস্ফীতির কারণ সম্পর্কে জানতে পারবেন ;
- বাংলাদেশে মুদ্রাস্ফীতির প্রভাব বর্ণনা করতে পারবেন।

আপনি এর আগের পাঠে অর্থাৎ পাঠ-৩ এ আপনি মুদ্রাস্ফীতির কারণ ও ফলাফল জেনেছেন। এই পাঠে আপনি বাংলাদেশে মুদ্রাস্ফীতির কারণ ও এর প্রভাব জানতে পারবেন। যে সব কারণে বাংলাদেশে মুদ্রাস্ফীতি হয় তা নিম্নরূপ :

অর্থের যোগান

অর্থের চাহিদার তুলনায় যোগান বাড়লে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেবে। যেমন ধরুন, আপনি বাজারে গিয়ে একটি মাছ কিনতে চাচ্ছেন এবং দর দাম করছেন। ঠিক সেই মুহূর্তে আর একজন লোক সেই মাছটি আপনার চেয়ে বেশি দাম দিয়ে কিনে নিয়ে গেলেন তখন কি অনুভূতি সৃষ্টি হয় না যে, লোকটার টাকা বেশি আছে। এই অবস্থাটাকে আমরা অর্থের অতিরিক্ত যোগান বলতে পারি।

সরকার অতিরিক্ত ব্যয়

আধুনিক কালে, সর্ব ব্যবস্থায় সরকার আয়ের তুলনায় বেশী ব্যয় করে। এই আয় সরকারী আয়ের উৎসের চেয়ে অনেক বেশি। এই অতিরিক্ত ব্যয় সরকার নোট ছাপিয়ে, কিংবা জনসাধারণ ও বিদেশিদের নিকট হতে ঋণ নেয়। যখন ব্যয়ের সাথে সঙ্গতি রেখে আয় বাড়ে না, তখন মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে সরকার ব্যয় মিটানোর জন্য নতুন করে টাকা ছাপিয়েছে – যেমন নতুন ১০ টাকা, ১ টাকা ও ৫ টাকার মুদ্রা। আরও উল্লেখযোগ্য ১৯৯৭-৯৮ সালের ব্যয় মিটানোর জন্য সরকার ১.৮৯ মিলিয়ন ডলার বৈদেশিক ঋণ ও সাহায্য নিয়েছে এবং সরকার ব্যয় মিটানোর জন্য ১৯৯৭-৯৮ সালে ৬০০ কোটি টাকা ঋণ নিয়েছে।

দামস্তর বৃদ্ধির প্রত্যাশা

দামস্তর বাড়ার প্রত্যাশা অনেক ক্ষেত্রে মুদ্রাস্ফীতিকে ত্বরান্বিত করে। ভবিষ্যতে আয় ও মজুরি বেড়ে যেতে পারে এ ধারণা পোষণ করে ব্যবসায়ীগণ দ্রব্যসামগ্রীর দাম বাড়াতে পারে। বিদেশে দ্রব্যের চাহিদা বাড়তে পারে এই প্রত্যাশায় এই দ্রব্যমূল্য বাড়ে। যেমন ধরুন, এ বছর চালের উৎপাদন কম হয়েছে এ কথা শুনে যদি লোকজন বেশি পরিমাণ চাল কিনতে চায় তবে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিতে পারে। আবার ধরুন, নতুন পে-স্কেলের (১৯৯৭-৯৮ অর্থ বছরে) প্রস্তাব দেখে ব্যবসায়ী মহল দাম বাড়িয়েছে কারণ সরকারী কর্মজীবিদের বেতন প্রচুর বেড়ে যাবে এই আশংকায়। আবার ধরুন, বিশ্বে চা এর উৎপাদন কম হয়েছে শুনে আমাদের দেশের ব্যবসায়ীগণ চা এর মূল্য আভ্যন্তরীণ বাজারে বাড়িয়ে দিয়েছে।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ

প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে উৎপাদন প্রক্রিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় উৎপাদন হ্রাস পায়। তাই অর্থের সরবরাহ নির্দিষ্ট থাকায় মুদ্রাস্ফীতি দেখা যায়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৯০ সালের বন্যার পর দামস্তর কিছুটা বেড়েছিল।

উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি

উৎপাদনের উপাদানের দাম বৃদ্ধির ফলে উৎপাদন ব্যয়ের বৃদ্ধি ঘটে থাকে। যেমন ধরুন, ১৯৯৭-৯৮ অর্থ বছরে তেলের মূল্য ১৩ টাকা থেকে ২১ টাকায় উন্নীত হওয়ার ফলে যেসব কারখানায় উৎপাদনের উপকরণ হিসেবে তেল ব্যবহার করা হয় সেসব ক্ষেত্রে উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলে উৎপাদন ব্যয়ের বৃদ্ধি ঘটেছে যা মূল্যস্তরকে বাড়ায়।

শ্রমিক সংঘের প্রভাব

শ্রমিক সংঘের প্রভাবে মজুরী, মহার্ঘ ভাতা, বিনোদন ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা বাড়ানো হয় এবং কাজের পরিমাণ কমানো হয়। তাই শ্রমিকের আয় বাড়ে, উৎপাদন কমে যায় ও মজুরী বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি দেখা যায়।

উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, শ্রমিকদের দাবীর প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সরকার ইতোমধ্যে শ্রমিকদের মজুরী বৃদ্ধি সংক্রান্ত একটি সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব উপস্থাপনের জন্য "মজুরী কমিশন" গঠন করেছে। কমিশন যথারীতি তাদের প্রস্তাব পেশ করেছে। প্রস্তাবটির সরকারী অনুমোদনের পর থেকে শ্রমিকরা নতুন স্কেলে মজুরী পাচ্ছেন। নতুন মজুরী কমিশন ঘোষণা করেছেন যারা শ্রমিকদের দাবি দাওয়া পরীক্ষা করে দেখবেন।

চোরাচালানী ও মজুতদারী

কালোবাজারী ও চোরাচালানী ইত্যাদি দুর্নীতিপরায়ণ কাজের মাধ্যমে কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি করে। এক্ষেত্রে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, আমাদের দেশে সারের দাম চোরাচালান ও মজুতদারীর মাধ্যমে অসাধু ব্যবসায়ীরা বাড়িয়ে দেয়।

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে এর প্রভাব একত্রে বিশ্লেষণ করা অত্যন্ত কঠিন। তাই আমরা কয়েকটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ নির্ণায়কের উপর এই প্রভাব দেখব। যেমন ধরুন :

১. **ভোগকারীর উপর প্রভাব :** মুদ্রাস্ফীতির ফলে অর্থের ক্রয় ক্ষমতা হ্রাস পায়। ক্রেতারা সমপরিমাণ দ্রব্য দিয়ে পূর্বের তুলনায় কম পরিমাণ কিনতে ও ভোগ করতে পারে। এতে জীবনযাত্রার মান কর্মক্ষমতা ও কর্মোদ্দীপনা হ্রাস পায়। তাই জনজীবনে অভাব-অনটন নেমে আসে।

২. **ঋণ দাতা ও গ্রহীতার উপর প্রভাব :** ঋণদাতা মুদ্রাস্ফীতির ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং ঋণ গ্রহীতা লাভবান হয়। কারণ সমপরিমাণ অর্থ দ্বারা সে আগের তুলনায় কম পরিমাণ দ্রব্য কিনতে পারে।

৩. **শ্রমিক ও সীমিত আয়ের লোকের উপর প্রভাব :** শ্রমিক ও সীমিত আয়ের লোকেরা মুদ্রাস্ফীতির কারণে কম পরিমাণ দ্রব্য কিনতে পারে যার ফলে তাদের জীবনের অভাব আরও বাড়ে। যেমন দ্রব্য মূল্য যখন বাড়ে তখন আমাদের দেশের লোকজন প্রায়ই বলে কম টাকা দিয়ে কি সব নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য কেনা যায় ?

করদাতার উপর প্রভাব

করদাতা মুদ্রাস্ফীতির ফলে লাভবান হয়। কারণ সে পরিমাণ দ্রব্য বিক্রি করে সে উক্ত পরিমাণ কর পরিশোধ করতে পারে। ফলে করদাতা লাভবান হয়।

উৎপাদনকারীর উপর প্রভাব

উৎপাদনকারী মুদ্রাস্ফীতির ফলে লাভবান হয়। কারণ সে নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রব্য বিক্রি করে বেশি মুনাফা, সুদ ও সঞ্চয় পায়। ফলে উৎপাদন, বিনিয়োগ ও আয় বাড়বে।

কৃষকের উপর প্রভাব

উৎপাদনকারী যেমন মুদ্রাস্ফীতির ফলে লাভবান হয় তেমনি কৃষকও লাভবান হয়। কৃষক তার দ্রব্য বিক্রি করে আগের তুলনায় বেশি অর্থ লাভ করে যা উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।

আয় বন্টনের প্রভাব

মুদ্রাস্ফীতির ফলে ধনী ও উৎপাদনের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিরা লাভবান হয়। আর গরীব শ্রেণী আরও গরীব হয়। তাই ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে পার্থক্য বাড়ে যা সমাজের বিশৃঙ্খলা বাড়ায়।

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি

মুদ্রাস্ফীতির ফলে যেহেতু উৎপাদন বাড়ে, আয় বাড়ে, তাই মুদ্রাস্ফীতি আয় ও উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়ক।

বিনিয়োগকারীর উপর প্রভাব

মুদ্রাস্ফীতির ফলে বন্ড, ইকুইটি প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিনিয়োগকারীরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আর শেয়ার বাজারে বিনিয়োগকারীরা লাভবান হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

১। সরকারের অতিরিক্ত ব্যয় কি?
২। আয়স্তর বৃদ্ধির প্রত্যাশা কি মুদ্রাস্ফীতি ঘটায়?
৩। উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি কি মুদ্রাস্ফীতিতে প্রভাব ফেলে?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। বাংলাদেশে মুদ্রাস্ফীতির কারণগুলো কি কি?
২। বাংলাদেশের মুদ্রাস্ফীতি প্রতিকারের উপায় আলোচনা করুন।